শাক্ত পদাবলী

ডঃ তাপস অধিকারী

সহকারী অধ্যাপক, ইসলামপুর কলেজ

আগমনী ও বিজয়া গান — সাধারণ বাঙালির নিজস্ব ঘরের কাহিনি

মধ্যযুগের শেষলগ্নে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে এবং তার পরবর্তীকালে রচিত শাক্ত পদাবলী বাংলা সাহিত্যের এক অনন্য সাধারণ সম্পদ। বৈষ্ণব পদাবলীর মত শৃঙ্গার রস এর উপজীব্য নয়, তার পরিবর্তে এখানে প্রাধান্য পেয়েছে বাৎসল্য রস। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রাধাকৃষ্ণের প্রেমভক্তি মূলক বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা সাহিত্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ধীরে ধীরে রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলা জাতীয় জীবনে তার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং মাতৃদেবীর পূজার্চনা প্রভাব বিস্তার করে। বৈষ্ণব সাহিত্য যেমন রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে, তেমনি শাক্ত পদাবলীর উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে উমা, পার্বতী, চন্ডী ও কালিকাকে কেন্দ্র করে। শাক্ত পদাবলীর দু'টি বিশিষ্ট পর্যায় হল আগমনী ও বিজয়া। এগুলিতে উমার পিতৃগৃহে আসা ও পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামীগৃহে যাত্রা প্রসঙ্গে মা মেনকার হৃদয়ের নানা টানাপোড়েন প্রাধান্য লাভ করেছে। এই পর্যায়গুলি দেবদেবীকে কেন্দ্র করে রচিত হলেও এগুলির মধ্যে বাঙালির জীবনের প্রাত্যহিক নানা ঘটনার পরিচয় দেওয়া আছে। ফলে পদগুলি সাধনা ও ভক্তিবাদকে অতিক্রম করে অনেকটাই মানবিক হয়ে উঠেছে।

মধ্যযুগের উজ্জ্বল সৃষ্টি শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া বিষয়ক পদগুলিতে একদিকে যেমন মা মেনকার মাতৃহৃদয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, তেমনি এ পদগুলিতে তৎকালীন বাঙালি জীবনের নানা চিত্র ফুটে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—

''আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত রচয়িতা কবিগণ মোটামুটিভাবে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজ উদ্ভূত। ফলে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত সমাজের ছবিটি যেমন বাস্তবরূপে ফুটে উঠেছে, তেমনি আমাদের অন্য কোন জাতীয় সাহিত্যে আর এমনটি দেখিতে পাই না।''

শাক্ত পদাবলীর একটি বিশিষ্ট দিক হল উমাসঙ্গীত অর্থাৎ আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত। তিনদিনব্যাপী দুর্গোৎসবের সঙ্গে অল্পবয়স্কা, বিবাহিতা বাঙ্গালী কন্যার তিনদিনের জন্য পিতৃগৃহে আগমনের বিষয়টি এই গানগুলির সঙ্গে গভীরভাবে সংযুক্ত। দশমীতে বেজে ওঠে বিষাদের সুর। বাঙ্গালী কন্যার প্রতীক তথা প্রতিনিধি উমা সেদিন পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতিগৃহ হিমালয়ের কৈলাসে ফিরে যান। মা মেনকা কন্যার বিরহে অশ্রুপাত করেন এবং আগামী বছরের শরৎকালের জন্য আবার প্রতীক্ষা করেন। উমার বিবাহ হয়েছিল বাল্যকালে। সেকালে এজাতীয় বিবাহকে বলা হত গৌরিদান প্রথা। উমার বর্ষিয়ান স্বামী মহাদেব কুলীন ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি। তার সংসারে একধিক পত্নী; তিনি শ্মশাণচারী, নেশাগ্রস্থ, ভিক্ষাজীবী এবং বিষয়কর্মে উদাসীন। এরূপ স্বামীর গৃহে উমা থাকায় তার মা মেনকা ভীষণ চিন্তিত। এই চিন্তারই প্রকাশ ঘটেছে আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতগুলিতে।

বাঙ্গালীর ঘরে অভাবগ্রস্থ কন্যার জন্য মায়েদের যেমন বিনিদ্র প্রহর কাটে তেমনি অভাবগ্রস্থ কন্যা উমার জন্য মা মেনকার বিনিদ্র প্রহর কাটে।

শরৎকালের নিশিশেষে গিরিরাজ পত্নী মেনকা কন্যাকে স্বপ্নে দেখে উৎকণ্ঠিত হয়ে স্বামীকে ডেকে বলেন—

''আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে
গিরিরাজ, অচেতনে কতনা ঘুমাও হে।
এই এখনি শিয়রে ছিল,
গৌরি আমার কোথা গেল হে।''

এ ভাবনা যে কোন বাঙালি মায়েরই ভাবনা। স্বামীর ঔদাসীন্য দেখে মেনকার অভিমান আরও বৃদ্ধি পায়। তার ধারণা হয় দরিদ্র জামাতা মহাদেব হয়ত উমার সমস্ত অলংকার ও বসন-ভূষণ বিক্রি করে দিয়েছে। সেই আশঙ্কায় তিনি স্বামীকে বলেন—

''যাও যাও গিরি আনিতে গৌরি
উমা বুঝি আমার কাঁদিছে।
উমার যতেক বসন ভূষণ
ভোলা সব বুঝি বেচে খেয়েছে।''

এভাবে কন্যা বিচ্ছেদে বাঙালি মায়েদের যে মানসিক অবস্থা হয়, মেনকারও তাই হয়েছে।

গিরিরাজ কৈলাসে মেয়েকে আনতে গেলে মা মেনকার মাতৃহৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। মেনকা স্বামীকে জানান—

''গিরি, এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে মন্দ লোকে, কারও কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগরা জামাই বলে মানব না।''

অপত্যস্নেহের এই অভিব্যক্তি অত্যন্ত আন্তরিক। শাক্তকবিরা মেনকার মাধ্যমে বাঙালি জননীর বিশিষ্ট অনুভূতিকে যথার্থ সজীবতা এইভাবে প্রদান করেছেন।

এরপর পিতার সঙ্গে উমা হিমালয়ে আসেন। সপ্তমীর প্রভাতে মা-মেয়ের প্রভাত রাগিনী বেজে ওঠে। হাসি, ঠাট্টায়, গল্পে, আনন্দে, মজায়, কোলাহলে তাদের তিনদিন কেটে যায়— আসে নবমীর রাত্রী। এই নবমীর রাতেই মা মেনকার হৃদয়ে আসন্ন বিচ্ছেদের কালোছায়া নেমে আসতে শুরু করে। তাই তিনি নবমীর রাত্রীকে প্রার্থণা করেন—

''ওরে নবমীর রাত্রী না হইওরে অবসান
শুনেছি দারুণ তুমি না রাখ সতের মান।''

কিন্তু নিষ্ঠুর প্রকৃতি জননীর মিনতিতে সাড়া দেয় না— নবমীর রাত্রীর অবসান ঘটে। এরপর বিজয়ার দিন উপস্থিত হলে গৌরিকে নিয়ে যাবার জন্য মহাদেব শ্বশুর বাড়িতে এসে হাজির হন। বুক ভর্তি বেদনা নিয়ে মেনকা কন্যা গৌরিকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠান। বিদায় লগ্নের মেনকার যন্ত্রণার কথা রামপ্রসাদ একটি গানে মর্মস্পর্শী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন—

''তণয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কী বিড়ম্বনা বিধাতার।''

এভাবে শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত গুলির মাধ্যমে শাক্ত পদাবলীতে মা মেনকাকে আমাদের সামনে প্রকাশ করেছেন। মেনকার এই ব্যাথা, এই উদ্বেগ যেন বাঙালি গৃহের প্রতিটি মায়ের ব্যাথা ও উদ্বেগ। কন্যাকে ছেড়ে প্রত্যেকটি বাঙালি মা-ই মেনকার মত উৎকণ্ঠিত থাকেন। তাই আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিতে শুধু কৈলাসের দেবদেবীদের জীবন কাহিনি প্রাধান্য পায়নি; মর্তের ধুলি ধুসরিত জীবন ও উজ্জ্বলভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। ফলে এগুলি শাক্তসাধনা ও ভক্তিভাবকে অতিক্রম করে অনেকবেশি মানবিক হয়ে উঠেছে। ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত আগমনী ও বিজয়ার গানগুলি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, এগুলি আমাদের অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালির গৃহপ্রাঙ্গণে নিয়ে যায়। এ গানগুলি পড়তে পড়তে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছায়া সুশীতল বাঙলার পর্ণকুঠিরগুলি। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতে শাক্ত পদাবলীতে কৈলাস ও মানস সরোবর বাংলার আমবাগান, পানাপুকুরে রূপান্তরিত হয়েছে।

আগমনী ও বিজয়া পদগুলি — বাঙালির মাতৃহৃদয়ের গান

মধ্যযুগের শেষলগ্নে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তির আরাধ্যা দেবী দুর্গা, চন্ডী, কালিকা, উমাকে নিয়ে এক শ্রেণীর সাহিত্য রচনা করা হয়েছিল যা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। এই শাক্ত পদাবলীতে দেবী দুর্গার ঘর গৃহস্থালী থেকে শুরু করে নানা বিষয় নিয়ে পদকর্তারা তাদের পদগুলি রচনা করেছেন। অনেক সময় এই পদগুলিতে দেবতারা তাদের মাহাত্ম্য ভুলে মানুষের পর্যায়ে নেমে এসেছেন। শাক্ত পদাবলীকে যে সমস্ত পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে তার মধ্যে দু'টি বিশিষ্ট পর্যায় হল— আগমনী ও বিজয়া। শরৎ ঋতুতে গিরিরাজ কন্যা উমার পতিগৃহ অর্থাৎ শিব গৃহ কৈলাস থেকে পিতৃগৃহ হিমালয়ে আগমনের সঙ্গে সম্পর্কিত যে পদগুলি রচিত হয়েছে সেগুলিকে আগমনী পর্যায়েরে পদ বলে। আর সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিনদিন পিতৃগৃহ হিমালয়ে অবস্থান করার পর উমার আবার পতিগৃহ কৈলাসে ফিরে যাবার সঙ্গে সম্পর্কিত যে পদগুলি রচিত হয়েছে সেগুলিকে বিজয়া পর্যায়ের পদ বলে। এই আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের পদগুলিতে

কন্যা উমাকে কেন্দ্র করে তার মা মেনকার নানা আশা, ভরসা, উদ্বেগ, হতাশা, দুঃখ, যন্ত্রণা বর্ণিত হয়েছে। পদগুলির মূলেই আছে মা ও কন্যার বাৎসল্য সম্পর্কের কথা। তাই এই পদগুলির মূলরস হল বাৎসল্য রস।

মধ্যযুগের পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এক সাহিত্যধারা প্রবাহিত ছিল যার নাম বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা। এখানে বৈষ্ণব পদকর্তারা রাধাকৃষ্ণের প্রেমজীবনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করে পদ রচনা করলেও তাদের পদ রচনা শুধু মাত্র রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনাতেই থেমে থাকেনি; এর বাইরে তারা কৃষ্ণের বাল্যজীবনের কথাও বলেছেন। সেই বাল্যজীবনের কথা বলতে গিয়ে মা যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে তারা কিছু পদ রচনা করেছেন। আবার ভক্ত বৈষ্ণবরা শ্রীচৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি বিগ্রহ বলে মনে করতেন। তাই বৈষ্ণব কবিরা চৈতন্যদেবের বাল্যজীবন ও তার মা শচীদেবীকে নিয়েও বেশ কিছু পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর এই পদগুলি বাৎসল্য রসের পদ। তবে বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদের চেয়ে শাক্ত পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদ অনেক বেশি আকর্ষণীয়। বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণব পদকর্তারা শ্রীকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার ধরেই পদ রচনা করেছেন। তাই পদগুলির সর্বত্র দেবত্বের ছোয়া থেকে গেছে; কিন্তু শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিতে শাক্ত পদকর্তারা যেভাবে মা মেনকার মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন তার মধ্য দিয়ে সর্বযুগের সর্বকালের বাঙালি পরিবারের মায়ের মনস্তত্ত্বই ফুটে উঠেছে। বাঙালি পরিবারে মায়েরা মেয়েদের বিয়ে দিয়ে শ্বশুর বাড়িতে পাঠানোর পর প্রবল উদ্বেগে শারদোৎসবের দিনগুলির জন্য অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করেন। কারণ এসময় মেয়েরা সাধারণত শ্বশুরবাড়ি থেকে বাপের বাড়িতে আসে এবং উৎসবের দিনগুলি ফুরিয়ে গেলে পুনরায় শ্বশুরবাড়ি ফিরে যায়।

শাক্ত পদকর্তারা যে কোন বাঙালি মায়ের চিরন্তন মনস্তত্ত্বকে আগমনী ও বিজয়া গানের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন জন্য এই পর্যায়ের পদগুলি বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদগুলিকে অতিক্রম করে গেছে। তাই শাক্ত পদাবলীর আগমনী ও বিজয়ার পদগুলিকে 'বাঙালির মাতৃহৃদয়ের গান' বলা হয়। মেয়ে শ্বশুরবাড়িতে থাকার সময় বাঙালি মায়েরা যেমন নানা কারণে মেয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। উমার মা মেনকাও তার মেয়ে উমার শ্মশানচারী, সংসারবিমুখ ভোলানাথের সাথে বিয়ে হয়েছে জন্য সর্বদা উদ্বিগ্ন থাকেন। মেনকা ভাবেন শিব বুঝি তার মেয়েকে কষ্টে রেখেছেন। তার এই দুশ্চিন্তার প্রকাশ স্বপ্নের মধ্যেও ঘটে। মেনকা উমাকে স্বপ্নে দেখে বলেছেন—

''বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ
হেমাঙ্গী হইয়াছে কালীর বরণ;
হেরে তার আকার, চিনে ওঠা ভার,
সে উমা আমার উমা নাই হে আর।''

মেনকা স্বপ্নে উমাকে আরও নানাভাবে দেখেছেন। মা মেনকা যতবার উমাকে স্বপ্নে দেখেন তার উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগ ততই বৃদ্ধি পায়। মা মেনকার মত অবস্থা মেয়ে বিয়ে দেবার পর প্রত্যেক বাঙালি মায়ের মধ্যেই দেখা যায়।

কৈলাসে উমার অবস্থান করার সময় মেনকা যখন উদ্বিগ্ন ও উৎকণ্ঠিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন তখনই আকাশে বাতাসে শরৎ ঋতুর আগমনী বার্তা ঘোষিত হয়। শরৎকালেই উমা বাপের বাড়িতে আসে। তাই শরতের আভাস পাওয়া মাত্রই মেনকা চঞ্চল হয়ে ওঠেন—

''শরতের বায়ু যখন লাগে গায়
উমার স্পর্শ পাই, প্রাণ রাখা দায়।''

এরূপ অবস্থাতে মেনকা তার কন্যার জন্য আকুল হয়ে পড়েন। তিনি স্বামী গিরিরাজকে উমাকে আনতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করেন। গিরিরাজ হিমালয় তৎক্ষণাৎ মেয়েকে আনতে যেতে উদ্যোগী না হলে মেনকা গিরিরাজকে অভিযোগ করে বলেন—

''আজি কালি করে দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে?
প্রতিদিন কী হে আমায় ভুলাবে, এ কী তব অবিচার।''

এরপর উমা আনার সময় হলে স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে গিরিরাজ হিমালয় উমাকে আনার জন্য কৈলাসে যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করেন। এই সময় মেনকা গিরিরাজকে তার মনের একান্ত আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে বলেন—

''গিরি, এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে মন্দ লোকে কারও কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়,
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগরা জামাই বলে মানব না।''

এই গানটির মধ্য দিয়ে মাতা কন্যার বাৎসল্য সম্পর্কের সুন্দর প্রকাশ দেখানো হয়েছে। শেষপর্যন্ত মেনকার অনুরোধে গিরিরাজ কন্যাকে আনবার উদ্দেশ্যে কৈলাসে রওনা দিলে মেনকার হৃদয় নানা ভাবনায় ব্যকুল হয়েছে—

''গিরিরাজ গমন করিল হরপুরে
হরিষে বিষাদে প্রমোদে প্রমাদে ক্ষণে দ্রুত ক্ষণে চলে ধীরে।''

অবশেষে উমা পিতার সাথে বাপের বাড়িতে এলে মেনকা তার কাছে ছুটে গিয়ে একের পর এক প্রশ্নবানে নিজের হৃদয়ের ব্যকুলতা প্রকাশ করেছেন। এই ব্যকুলতা মেয়েকে কাছে পাবার পর প্রত্যেক বাঙালি মায়ের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

''ও মা, কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা বলমা তাই।
কত লোকে কত বলে
শুনে ভেবে মরে যাই।''

এরপর সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিনদিন হাসি, আনন্দ, উচ্ছ্বাসে মা-মেয়ের কেটে যায় এবং উমার বিদায়ের দিন অর্থাৎ বিজয়া উপস্থিত হয়। মা মেনকা বিজয়ার আগেই নবমীর রাতেই কন্যার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় কাতর হয়ে ওঠেন। তাই নবমীর রাতের কাছে প্রার্থণা করেন—

''ওরে নবমীর নিশি না হইওরে অবসান
শুনেছি দারুন তুমি না রাখ সতের মান।''

কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে রাত্রি প্রভাত হয়। আর তার ফলে মা মেনকা আরও কাতর হয়ে পড়েন। মেনকার এই কাতরতার প্রকাশ ঘটেছে একটি পদে—

''কি হল নবমীর নিশি হইল অবসান গো
বিশাল ডমরু ঘন ঘন বাজে, শুনি ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।''

শেষপর্যন্ত মহাদেব এসে উমাকে নিয়ে চলে যায় আর মায়ের হৃদয় কান্নায় ফেটে পড়ে। গিরিরাজকে মেনকা তার দুঃখের কথা জানিয়ে বলেন—

''আমার গৌরিরে লয়ে যায় হর আসিয়ে
কি কবা হে গিরিবর রঙ্গ দেখ বসিয়ে।
বিণয় বচনে কত বুঝালাম নানা মত
শুনিয়া না শোনে কানে ঢলে পড়ে হাসিয়ে।''

এভাবে শাক্ত পদকর্তারা আগমনী ও বিজয়ার গানগুলিতে মা মেনকার মাতৃহৃদয়কে উদ্‌ঘাটিত করেছেন। মেনকার মানসিক অবস্থা সমস্ত বাঙালি মায়ের মানসিক আবস্থার সামিল। তাই আগমনী ও বিজয়ার পদগুলি একান্ত ভাবেই মাতৃহৃদয় থেকেই উঠে এসেছে। বৈষ্ণব কবিরা যশোদা মা ও শচী মাতাকে কেন্দ্র করে বাৎসল্য রসের পদ রচনা করলেও আগমনী ও বিজয়া পদগুলির সঙ্গে বাঙালির মাতৃহৃদয় যতটা যুক্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে ততটা নয়। তাই বৈষ্ণব পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদের চেয়ে শাক্ত পদাবলীর বাৎসল্য রসের পদ অনেক বেশি আকর্ষণীয়। এই কারণেই বলরাম দাস, বাসুদেব ঘোষ, নরহরি দাস, কবিশেখর প্রমুখ বৈষ্ণব পদকর্তাদের চেয়ে রামপ্রসাদ বা কমলাকান্তের মত শাক্ত পদকর্তারা এই বাৎসল্য রস সৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ।

ভক্তের আকুতি পর্যায়ে যুগজীবনের দুঃখ ও নৈরাশ্য

মধ্যযুগের শেষলগ্নে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তির আরাধ্যা দেবী দুর্গা বা কলিকার বন্দনা করে যে সাহিত্য রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে তা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদকর্তারা কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তাদের পদগুলি রচনা করেছেন। এই পর্যায়গুলির মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পর্যায় হল ভক্তের আকুতি। 'আকুতি' কথাটির অর্থ 'অভিলাস বা আগ্রহ'। শাক্ত পদকর্তারা শক্তির দেবীকে মহাদেবী রূপে কল্পনা করে এই পদগুলির মাধ্যমে তার চরণে নিজের অভিলাসের কথাই বলেছেন। স্বাভাবিকভাবে তাদের কবিতায় নিজেদের জীবনের নানা দুঃখ, দুর্দশার কথা এসেছে। এরফলে পদগুলিতে তৎকালীন যুগসমাজের অনেকটাই চিত্রিত হয়েছে।তবে শাক্ত পদকর্তারা তাদের পদে শুধু দুঃখের কথাই বলেন নি; পাশাপাশি মায়ের কাছে থেকে এই দুঃখ দূর করার জন্য সাহস ও প্রতিরোধের দীক্ষামন্ত্রও চেয়েছেন।

সমগ্র মধ্যযুগের সাহিত্য পর্যালোচনা করলে দেখা যায় এযুগে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ধর্ম প্রাধান্য পেয়েছে। কবিরা তাদের আরাধ্য দেবদেবীর কাছে অর্থ, সুখ, নিরাপত্তা প্রভৃতি প্রার্থনা করেছেন। আবার বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণব ভক্তেরা রাধাকৃষ্ণের নাম জপ করে মানস বৃন্দাবনে তাদের নিত্যলীলা দর্শনের অভিলাস ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু শাক্ত পদাবলীতে শাক্তকবির সঙ্গে জগন্মাতার সম্পর্ক সন্তান-মাতার। এ সম্পর্ক অতি সহজ এবং আন্তরিক। প্রকৃতপক্ষে সন্তান ও মায়ের মধ্যে স্নেহ-মমতা, মান-অভিমানের যে সম্পর্ক থাকে শাক্ত পদকর্তারা এখানে সে সম্পর্কেই জগৎ মাতাকে দেখেছেন। এর পরিচয় কবিদের আকুতিতে, অভিমানে, কখনও বা রোষে অতিস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। চিত্তরঞ্জন দাস গীতিকবিতা বিষয়ক একটি প্রবন্ধে বলেছিলেন এই অভিমানই বাংলা কবিতার সম্পদ। এমন করে অভিমান পৃথিবীর কোন সাহিত্যেই প্রকাশিত হয়নি।

ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে কবিদের অভিমান, দুঃখ, রোষ, আকুতি প্রভৃতি প্রাধান্য পেয়েছে। কবিরা এই পদগুলিকে তাদের সাধনতত্ত্ব হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই তারা খুব সহজেই বলেছেন—

''তাই আমি অভিমান করি শঙ্করী।''

এই অভিমানবশত কবি দুঃখ পেয়ে তা প্রকাশ করে বলেছেন—

''মাগো তারা ও শঙ্করী
কোন অবিচারে আমার 'পরে করলে দুঃখের ডিক্রিজারি।''

আবার এই অভিমান যখন চরম সীমায় পৌঁছায় তখন কবি বলেন—

''এবার কালী তোমায় খাব
তুমি খাও, নয় আমি খাই, দু'টোর একটা করে যাব।''

উপাস্য দেবীর সঙ্গে কবিদের এই সম্পর্ক ছিল জন্যেই তারা কখনই পার্থিব সম্পদের জন্য লালায়িত হয়নি। পদগুলির যেখানেই দুঃখের দাবানল থেকে মুক্তির দাবী করেছেন, সেখানেই মায়ের প্রতি সন্তানের দাবীতেই করেছেন। এখানে কবিরা কেবল মায়ের অভয়পদ প্রার্থণা করেছেন; কারণ তারা জানেন মায়ের অভয়পদে আশ্রয় নিতে পারলেই সংসারের মায়াবন্ধন কেটে যাবে। তাই তাদের আকুতি কখনোই নৈরাশ্যবাদীর ক্রন্দন হয়ে পড়ে নি। দুঃখ যখন তীব্র তখন মন ভেঙে পড়াই স্বাভাবিক; কিন্তু মাতার প্রতি অসীম বিশ্বাসে কবিরা বুঝতে পেরেছেন যে, দুঃখই দুঃখের শেষ কথা নয়— দুঃখ কেবল ভবযন্ত্রণা ও মায়াবদ্ধতার একটি দিক মাত্র, মায়ের বরাভয় পেলে দুঃখ আর থাকবে না। শাক্ত কবিরা বিশ্বাস করতেন জীবনে দুঃখ আছে— তাই তারা কখনোই জীবন বিমুখ হন নি। যেমন একটি পদে বলা হয়েছে—

''মা, না করি নির্বাণে আশ, না চাহি স্বর্গাদি বাস,
নিরখি চরণ দু'টি হৃদয়ে রাখিয়ে।''

ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে ভক্তের এই মর্ত প্রীতি ও অস্ত্যর্থক চিন্তাই প্রাধান্য পেয়েছে।

শাক্ত কবিগণ দুঃখের জ্বালায় কখনও কখনও মুক্তির প্রার্থণা করেছেন। তারা কখনও মায়ের কাছে আকুতি জানিয়ে বলেছেন—

''ভবের গাছে বেঁধে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।''

কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কবিরা তদের জীবনের এই দুঃখকে মায়ের লীলা মাত্র বলেছেন। যেমন রামপ্রসাদ বলেছেন—

''ও মা কালী চিরকালই সঙ্ সাজালি এ সংসারে
এ সঙ্ সাজায় নাইকো মজা, সাজা পাই মা অন্তরে।''

এ ভাবনা ছিল জন্যেই শাক্ত কবিরা দুঃখে ভেঙে পড়েন নি। তারা মায়ের কাছে প্রশ্ন করেছেন— 'আমি কী দুঃখেরে ডরাই?'। কবিরা জানেন তাদের জীবন থেকে দুঃখ চলে যাবে। তাই তারা শেষপর্যন্ত মায়ের চরণেই আশ্রয় পেতে চান—

''মনের এই বাসনা শ্যামা শবাসনা, শোন মা বলি
অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বলতে পায় মা কালী কালী।''

এভাবে শাক্ত পদকর্তারা তাদের রচিত পদগুলিতে জীবনের নানা দুঃখের কথা নিবেদন করেও শেষপর্যন্ত তাদের আরাধ্যা মায়ের চরণে আশ্রয় পেতে চেয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই তাদের পদগুলিতে অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলার অবক্ষয়ের যুগের যুগ জীবনের দুঃখ ও নৈরাশ্য ছায়া ফেলেছে। কিন্তু দুঃখ ও নৈরাশ্যকে তারা জীবনের সর্বস্ব বলে মেনে নিতে চান নি— সেখান থেকে উত্তরণের কথা বলেছেন। সামাজিক জীবনপটে তারা মায়ের চরণে নিজেদের আকুতি জানিয়ে দুঃখকে জয় করার জন্য সাহস ও প্রতিরোধের দীক্ষামন্ত্র লাভ করতে চেয়েছেন। এই শাক্ত পদকর্তাদের চাওয়া পাওয়ার সাথে বৈষ্ণব পদকর্তাদের চাওয়া পাওয়ার পার্থক্য আছে। বৈষ্ণব পদকর্তাদের বেশিরভাগই ছিলেন সংসার ত্যাগী। তাদের উপাস্য দেবতা পার্থিব সম্পদের দেবতা নয়; প্রেমের দেবতা। কিন্তু শাক্ত পদকর্তাদের পদে শক্তির দেবী বিপন্ন মানবকে অভয়দানের জন্য আবির্ভূতা। স্বাভাবিকভাবে ভক্তের আকুতি পর্যায়ে পার্থিব ঐশ্বর্যলাভের চিন্তা ও সুখভোগের আর্তি এসেছে, তবে তা স্বতন্ত্রভাবে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলিতে জগন্মাতার সঙ্গে পদকর্তাদের সরাসরি মাতা-পুত্রের সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। পদকর্তারা শক্তিদেবীর কাছে নিজেদের আকুতি জানিয়েছেন। তাই পদগুলিকে আধ্যাত্ম সঙ্গীত হিসাবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু পদকর্তাদের আকুতিতে ভক্তিভাব যতটা প্রাধান্য পেয়েছে, প্রায় সমপরিমাণ অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগজীবনের হতাশা, নৈরাশ্য, যন্ত্রণা প্রাধান্য পেয়েছে। তাই শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি নিছক আধ্যাত্ম সঙ্গীত হয়ে থাকেনি, যথার্থ মানব সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। শাক্ত পদকর্তারা প্রায় সবাই সহজ-সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন করতেন। তাদের এই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপনের প্রভাব তাদের উপস্থাপনাতেও পড়েছে। স্বাভাবিকভাবে সাধনতত্ত্বের বিষয় হলেও পদগুলি যে কোন পাঠককে আকৃষ্ট করে। তাই সামাজিক জীবনকে নিয়ে লেখা শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদগুলি সাধনতত্ত্ব হয়েও যথার্থ মানব জীবন সঙ্গীত হয়ে উঠেছে। এরসাথে যুক্ত হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগযন্ত্রণা, হতাশা, নৈরাশ্য এবং তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাহস ও প্রতিরোধের ভাবনা।

রামপ্রসাদ সেনের কবি কৃতিত্ব

মধ্যযুগের শেষলগ্ন অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তির আরাধ্যা দেবী দুর্গা বা কলিকাকে অবলম্বন করে যে সমস্ত পদ রচিত হয়েছিল বাংলা সাহিত্যে তা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদকর্তারা এই পদগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে বিভক্ত করে তাদের আরাধ্য দেবীর আরাধনা করেছিলেন। এই পর্যায়গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আগমনী, বিজয়া ও ভক্তের আকুতি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই অনেক পদকার শাক্ত পদগুলি রচনা করেছেন। এই পদকারদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন রামপ্রসাদ সেন। তাঁর সম্পর্কে ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

''বৈষ্ণব পদাবলীর মত রামপ্রসাদের গান বৈকুণ্ঠের গান নয়; তার সঙ্গে ধুলি ও ধরিত্রীর নিরন্ত যোগ আছে বলে আধ্যাত্মিকতা বাদ দিলেও তার কাব্যরস উপলব্ধি করা যায়— যে কাব্যরস বাস্তব জীবনকে অবধারণ করে আছে।''

শাক্ত পদাবলীর শ্রেষ্ঠ পদকর্তা রামপ্রসাদ সেনের জন্ম আনুমানিক ১৭২০-২১ খ্রিস্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর জন্মস্থান ২৪ পরগণা জেলার হালিশহরের কুমারহট্ট গ্রাম। তিনি তান্ত্রিক মতে কালী সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তার গুণগ্রাহী ছিলেন। গৃহী ও সাধক রামপ্রসাদ একাধারে কবি ও গায়ক ছিলেন। কথিত আছে নবাব সিরাজদৌলাও তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। ভক্তিই ছিল রামপ্রসাদ সেনের প্রধান সম্পদ। নিজস্ব চিন্তা, ভাবনা, সুখ-দুঃখ, ইহাকাল-পরকাল তিনি শ্যামামায়ের চরণে অর্পন করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাকে 'কবিরঞ্জন' উপাধি দিয়েছিলেন। রামপ্রসাদ তাঁর অসামান্য কবি প্রতিভাবলে প্রায় তিন শতাধিক সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। রামপ্রসাদের এই সঙ্গীতগুলি রামপ্রসাদী সঙ্গীত নামে পরিচিত। রামপ্রসাদী সঙ্গীতগুলি উদার আকাশের মত বিশাল। শ্যামার সন্তান রামপ্রসাদ আধ্যাত্মিকতা, সমাজ এবং বাস্তব কাব্যরসের ত্রিবেদী রচনা করে ভক্তিগীতি সাহিত্যকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছিলেন। তার নিরাভরণ সহজ-সরল সুরগুলিতে মাতা ও পুত্র এবং তাদের মান অভিমানের সম্পর্ক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। রামপ্রসাদের গানগুলির মধ্যে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। যথা—

১) উমা বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া),
২) সাধনা বিষয়ক (তান্ত্রিক সাধনা পদ্ধতি) এবং
৩) তত্ত্ব, দর্শন ও নীতি বিষয়ক প্রভৃতি।

রামপ্রসাদ আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ের খুব বেশি পদ রচনা করেন নি। তবে যে কয়েকটি পদ রচনা করেছেন সেগুলির গুরুত্ব কোন দিক দিয়ে কম নয়। তার—

''গিরি এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারও কথা শুনব না।''

এই পদটির কাব্যিক সৌন্দর্যে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট রচনা। এখানে বাঙালি মায়ের কথা প্রকাশিত হয়েছে জন্য পদটি দীর্ঘদিন ধরে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। আবার রামপ্রসাদের বিজয়া বিষয়ক একটি পদ—

''তনয়া পরের ধন, বুঝিয়া না বুঝে মন
হায় হায় এ কী বিড়ম্বনা বিধাতার।''

এখানেও বাঙালি মাতৃজীবনের ট্রাজেডিকে রামপ্রসাদ অত্যন্ত বাস্তব সচেতন ভাবে প্রকাশ করেছেন; ফলে এই পদটিও দীর্ঘদিন ধরে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে আসছে। উপরে উল্লিখিত আগমনী ও বিজয়ার পদ দু'টি ছাড়াও রামপ্রসাদ আরও বেশ কিছু আগমনী ও বিজয়ার পদ রচনা করেছেন, যেগুলি কাব্যসৌন্দর্যে যথেষ্ট উজ্জ্বল। আজও শারদোৎসবের সময় বিভিন্ন প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীতগুলি বাজানো হয়। এ থেকেই বোঝা যায় আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ে রামপ্রসাদ কতটা প্রতিভার ছাপ রেখেছেন।

রামপ্রসাদ ভক্ত ও সাধক ছিলেন। মহাশক্তিরূপিনী আরাধ্যা কালী মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল মাতা-পুত্র সম্পর্ক। তাদের এ সম্পর্ক স্নেহ-ভালোবাসা, মান-অভিমান ও ভক্তিরসে পরিপূর্ণ। বিশ্বজননীকে তিনি ঘরের মায়ের আসনে বসিয়ে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে আন্তরিক ভাবে ভক্তি নিবেদন করেছেন। স্বর্গ ও মর্তের, আকাশ ও মাটির সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে তার গানে। রামপ্রসাদের ভক্তের আকুতি পর্যায়ের কোন কোন পদে শিশুসুলভ আবদার, অভিযোগ, তিরস্কার ও অভিমান প্রকাশিত হয়েছে। কখনও তিনি মায়ের কাছে নিজের ব্যক্তি জীবনের দুঃখের কথা নিবেদন করে বলেছেন—

''মা, আমায় ঘুরাবি কত
কলুর চোখ ঢাকা বলদের মত
ভবের গাছে জুড়ে দিয়ে মা পাক দিতেছ অবিরত।''

আবার কখনও রামপ্রসাদ তাঁর আরাধ্যা কালীমায়ের উদ্দেশ্যে অশিষ্ট ভাষায় কটু বাক্যবর্ষণ করে বলেছেন—

''এবার কালী তোমায় খাব,
তুমি খাও, নয় আমি খাব দু'টোর একটা করে যাব।''

রামপ্রসাদের গানে যে সহজ ভক্তিভাব ফুটে উঠেছে তা সর্বজনবোধ্য প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। সহজিয়া চন্ডীদাসের মত তিনি সহজ-সরল ভাবে গভীর উপলব্ধির কথা বলেছেন। তার গানে জীবনরস, আধ্যাত্মিকতা, দার্শনিকতা, গূঢ়তত্ত্বকথা একসঙ্গে মিলেমিশে রয়েছে। ধর্মীয় উদারতা তার গানের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি সাম্প্রদায়িক ধর্ম বিদ্বেষের মূলে কুঠারাঘাত করে শাস্ত্রীয় পূজা ও পূজার উপকরণের তুচ্ছতার দিকটিকে সহজ ভাষায় সকলের কাছে তুলে ধরেছেন। তাঁর দৃষ্টিতে পূজার বাহ্যিক উপকরণ নিতান্ত অন্তঃসারশূণ্য, অন্তরের ভক্তিভাবই মূলকথা। সেই ভক্তিভাবের সাধনায় পশুবলীর পরিবর্তে নিজের ষড় রিপুকে বলি দিতে হবে—

''মন তোর এত ভাবনা কেনে
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে
জাগজমকে তারে করবে পূজা, জানবে নারে জগজনে।''

কালীমায়ের বন্দনা প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের গানে কখনও কখনও নীতিকথার উল্লেখ চলে এসেছে—

''ডুব দেরে মন কালী বলে
হৃদি রত্নাকরের অগাধ জলে
কামাদি ছয় রিপু আছে তাহার লোভে সদাই চলে।
তুমি বিবেক হলদি গায়ে মেখে নাও।
ছোবে না তার গন্ধ পেলে।''

ব্যক্তিগত জীবনে রামপ্রসাদ অনেক দুঃখ-কষ্ট পেলেও সেই যন্ত্রনাকে তিনি নীলকণ্ঠের মত ধারণ করে অমৃতের সাধনা করে গেছেন। কোন কোন সঙ্গীতে তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। যেমন—

১) ''ও মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো,
ও মা, মিঠার লোভে তিত মুখে সারাদিনটা গেল।''

২) ''দেখ সুখ পেয়ে লোকে গর্ব করে
আমি কী দুখেরে ডরাই?''

এসব সঙ্গীত জীবনযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত মানুষকে পরম সান্ত্বনা দান করে। রামপ্রসাদের গানে ভক্তিভাব ও আধ্যাত্মিকতা প্রধান হলেও তার সাথে বাস্তব জীবনের গভীর সাদৃশ্য আছে। তার গানগুলির মধ্যে সমকালীন সমাজ জীবনের সুখ-দুঃখ, লাঞ্ছনা, ধর্মান্ধতা, দারিদ্রের ছবি ফুটে উঠেছে। তাই তাঁর ব্যবহৃত উপমা-রূপক গুলিতে গ্রাম্য চিত্র প্রাধান্য পেয়েছে। মানব-জমিন, কলুরবলদ, ডিক্রিজাড়ি, সংসার বাজার, চাষীর চাষ প্রভৃতি ভাষা তথা রূপকের মাধ্যমে সুখ-দুঃখ এবং বাঙালির চারপাশের পরিচিত জীবন ও গ্রাম্য পরিবেশ প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

এভাবে একান্ত সহজ-সরল, আটপৌঢ়ে ভাষায় রচিত রামপ্রসাদের সঙ্গীতগুলি প্রাণের আবেগে সমৃদ্ধ। রামপ্রসাদ লৌকিক ছন্দের সুষ্ঠ ও বহুল প্রয়োগ ঘটিয়ে তার পদগুলিতে যথেষ্ট শিল্প নৈপুন্যের পরিচয় দিয়েছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বহুবার রামপ্রসাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন। জনজীবনের সুখ-দুঃখের রসে সিক্ত বলেই তিনি সর্বকালের লোক কান্ত কবি। অধ্যাপক সুবোধ চৌধুরী তার সম্পর্কে বলেছেন– – ''প্রসাদি সঙ্গীতে আধ্যাত্ম সাধনা, বাস্তবতা এবং কাব্যরসের ত্রিবেদি সংগম রচিত হয়েছে * * * ভাব গভীরতা ও ঐকান্তিকতাই তার কবিতার প্রাণবস্তু।''

এই কারণেই রামপ্রসাদ তার সমকালে, পরবর্তীকালে এবং এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে তার রচনার মধ্য দিয়ে এগিয়েই চলেছেন।

মেনকা চরিত্র

মধ্যযুগের শেষলগ্নে অষ্টাদশ শতাব্দীতে শক্তির আরাধ্যাদেবী দুর্গা বা কালিকাকে অবলম্বন করে বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর সাহিত্য রচিত হয়েছে যা শাক্ত পদাবলী নামে পরিচিত। শাক্ত পদাবলীতে শাক্ত পদকর্তারা তাদের আরাধ্যা দেবী দুর্গার ঘর গৃহস্থালী থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে প্রচুর পদ রচনা করেছেন। এই পদগুলিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রধান দু'টি পর্যায় হল আগমনী ও বিজয়া।

দেবী দুর্গা মা মেনকাকে ছেড়ে একবছর পতিগৃহে থাকার পর শারদোৎসবের সময় মায়ের কাছে আসেন। এক বছর অপেক্ষা করার পর এসময় মায়ের হৃদয় নানা উদ্বেগে, উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। শাক্ত পদাবলীর যে সকল পদে উমার পিতৃগৃহে আসার সময় মা মেনকার উদ্বেগ আকুলতা ধরা পড়েছে সেই পদগুলিকে আগমনী পর্যায়ের পদ বলে। এরপর সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমী এই তিনদিন পিতৃগৃহে কাটানোর পর বিজয়ার দিন স্বামী মহাদেবের সাথে উমা মাকে ছেড়ে কৈলাসে ফিরে যাবার সময় মা মেনকার উদ্বেগ ও কাতরতার বর্ণনা দিয়ে শাক্ত পদকর্তারা যে পদগুলি রচনা করেছেন সেগুলিকে বিজয়া পর্যায়ের পদ বলে।

আগমনী ও বিজয়ার সঙ্গীতগুলি উমার পিতৃগৃহে আগমন ও পতিগৃহে যাত্রাকে উপলক্ষ্য করে রচিত হলেও এই পদগুলিতে বারবারই মা মেনকার মাতৃহৃদয় ধরা পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই শিব-দুর্গার কাহিনি অবলম্বনে শাক্ত পদাবলী রচিত হলেও শাক্ত পদাবলীতে উমার মা মেনকা একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হয়ে উঠেছে। শাক্ত পদাবলীর ধর্মীয় মূল্য ছাড়াও এর একটা সামাজিক মূল্য আছে; এখানে বাঙালি জীবনের বিবাহিতা মেয়ের সাথে মায়ের যে সম্পর্ক থাকে শাক্ত পদকর্তারা তাকে চিত্রিত করেছেন। সেই চিত্রে মেনকা সমগ্র বাঙালি মায়ের প্রতিনিধি হিসাবে চিত্রিত। তাই চরিত্রটি অষ্টাদশ শতাব্দী অতিক্রম করে এখনও সজীব। তার মধ্যে মাতৃহৃদয়ের অনুভূতি এবং কন্যার জন্য উদ্বেগ কাতরতা শাক্ত পদকর্তারা এতটাই স্বাভাবিকভাবে দেখিয়েছেন যে, মা মেনকা শাক্ত পদাবলীর একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

শাক্ত পদাবলীতে দেখা যায় গিরিরাজ হিমালয় ও মেনকার কন্যা উমার বাল্যবয়সেই শ্মশানচারী, সংসার উদাসীন শিবের সাথে বিয়ে হয়। মা মেনকা যে মেয়েকে ছোট থেকেই অত্যন্ত স্নেহে মানুষ করেছেন, তাকেই পরের হাতে তুলে দিতে হয়। যেহেতু উমার স্বামী মহাদেব শ্মশানচারী, সংসার উদাসীন তাই হিমালয়ে থেকে উমার মা মেনকা এক মূহুর্তের জন্য নিরুদ্বিগ্ন থাকতে পারেন না। তার অচেতন মনে মেয়ের জন্য নানা চিন্তা মাথা চারা দেয়। আর এই চিন্তার কারণেই তিনি দুঃস্বপ্ন দেখেন—

''আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে
গিরিরাজ, অচেতনে কত না ঘুমাও হে
এই এখনি শিয়রে ছিল, গৌরি আমার কোথা গেল হে।''

আদরের কন্যা স্বপ্নে দেখা দিয়ে আবার হারিয়ে গেলে মায়ের উদ্বেগ কাতরতা আরও বাড়ে। মা জানেন তার আদরের দুলালি কুলীন পাত্র শিবের ঘরে গেছে, সেখানে সতীনের জ্বালা আছে— তাকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। এই দুর্ভাবনা থেকেই মেনকা স্বপ্নে দেখে—

''বাছার নাই সে বরণ, নাই আভরণ,
হেমাঙ্গি হইয়াছে কালীর বরণ।
হেরে তার আকার চিনে ওঠা ভার
সে উমা আমার, উমা নাই হে আর।''

এ সময় মেনকার উদ্বেগ আরও বাড়িয়ে দিয়ে শরৎ ঋতুর আগমন ঘটে। যেহেতু শরৎ ঋতুতে উমা বাপের বাড়িতে আসে, তাই কন্যার জন্য মেনকা আকুল হয়ে পড়েন এবং স্বামী গিরিরাজকে উমাকে আনতে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি শুরু করে বলেন—

''যাও যাও গিরি আনিতে গৌরি
উমা বুঝি আমার কাঁদিছে।
উমার যতেক বসন ভূষণ
ভোলা বুঝি সব বেচে খেয়েছে।''

স্ত্রীর এই অনুরোধেও গিরিরাজ হিমালয় যখন কন্যা আনার জন্য তৎপরতা দেখান না, তখন মেনকা গিরিরাজকে অভিযোগ করে বলেন—

''আজি কালি করে দিবস যাবে
প্রাণের উমারে আনিবে কবে?
প্রতিদিন কি হে আমায় ভুলাবে
এ কি তব অবিচার।''

এরপর মেয়ে আনার সময় হলে গিরিরাজ হিমালয় উমাকে আনার জন্য কৈলাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। ঠিক এই মূহুর্তে মেনকা হিমালয়কে বলেন—

''গিরি, এবার উমা এলে আর উমা পাঠাব না
বলে বলবে মন্দ লোকে, কারও কথা শুনবা না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কয়
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগরা জামাই বলে মানব না।''

এই গানটির মধ্যদিয়ে বাঙালি মাতা-কন্যার চিরন্তন সম্পর্কটি প্রকাশিত হয়েছে। মেয়েকে পতিগৃহে রেখে মা-রা কত উৎকণ্ঠায় জীবন কাটান, মেয়েকে নিয়ে মায়ের কি স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা থাকে তা এই গানেই প্রকাশিত।

শেষ পর্যন্ত গিরিরাজ কৈলাস থেকে উমাকে নিয়ে ঘরে ফেরে। মেয়ের জন্য মা মেনকা এতটাই উৎকণ্ঠিত থাকেন যে, উমা আসার সঙ্গে সঙ্গে তার কাছে ছুটে গিয়ে একের পর এক প্রশ্নবানে তার মনের ব্যকুলতা প্রকাশ করেছেন। তিনি মেয়েকে প্রশ্ন করেছেন—

''ও মা, কেমন করে পরের ঘরে
ছিলি উমা বলমা তাই,
কত লোকে কত বলে
শুনে ভেবে মরে যাই।''

মেনকার এই উক্তিটিও মেয়ে বাড়ি ফেরার পর বাঙালি মায়েদের পক্ষে অত্যন্ত পরিচিত ঘটনা। দীর্ঘদিন পর পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে মেয়ে ফিরে এলে বাঙালি মায়েরাও এরূপ নানা প্রশ্নবানে তাকে জর্জড়িত করে তোলেন।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী এই তিনদিন উমা ও মেনকার হাসি, আনন্দে, সুখে, গল্পে খুব ভালোভাবেই কেটে যায়; এরপর উমার বিদায়ের দিন অর্থাৎ বিজয়া উপস্থিত হয়। মা মেনকার মন বিজয়ার আগেই নবমীর রাত থেকেই বিচ্ছেদ আশঙ্কায় কাতর হয়ে পড়ে। তিনি নবমীর নিশির কাছে প্রার্থনা জানিয়ে বলেন—

''ওরে নবমীর নিশি না হইওরে অবসান
শুনেছি দারুন তুমি না রাখ সতের মান।''

মেনকার এই প্রার্থনা বিফলে যায়; প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে নবমীর নিশির অবসান ঘটে এবং বিজয়া এসে হাজির হয়। বিজয়ার সাথে সাথে কৈলাস থেকে শিব ডমরু বাজিয়ে তার স্ত্রীকে নিয়ে যাবার জন্য শ্বশুর বাড়ি হিমালয়ে এসে উপস্থিত হন। এতে মেনকার বুক আরও ফেটে যায়। শেষপর্যন্ত মেনকা তার কন্যাকে আটকে রাখতে পাড়েন না, শিব উমাকে নিয়ে কৈলাসের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। এ সময় মেনকা গিরিরাজকে তার দুঃখ জানিয়ে বলেন—

''আমার গৌরিরে লয়ে যায় হর আসিয়ে,
কি কব হে গিরিবর রঙ্গ দেখ বসিয়ে।
বিণয় বচনে কত বুঝালাম নানা মত,
শুনিয়া না শোনে কানে, ঢলে পড়ে হাসিয়ে।''

এই সময় মেনকা আর একটি উক্তি করছেন যা থেকে বাঙালি মায়ের চিরন্তন ট্রাজেডি প্রকাশিত হয়েছে—

''তণয়া পরের ধণ বুঝিয়া না বুঝে মন,
হায় হায় এ কী বিড়ম্বনা বিধাতার।''

একটা বয়ঃসীমা অতিক্রম করলে মেয়েকে শ্বশুর বাড়িতে পাঠাতে হয়, এই চিরন্তন সত্য বাঙালি মা মাত্রই জানেন। তবুও তারা মেয়েকে কাছে রাখার আশা করেন— এ আশা যে কখনোই পুরণ হয় না, তা মেনকার এই উক্তিতেই ধরা পড়েছে।

এইভাবে শাক্ত পদকর্তারা আগমনী ও বিজয়া পর্যায়ে মেনকা চরিত্রটিকে বাস্তবসম্মত ভাবে পরিবেশন করেছেন। চরিত্রটির সাথে বাঙালি মা ওতোপ্রোত ভাবে যুক্ত জন্য চরিত্রটি যুগ অতিক্রম করে এখনও বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ হিসাবে গণ্য। তাই শাক্ত পদবলীর আলোচনা করতে গিয়ে সব আলোচকই মা মেনকাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর চরিত্রটিকে গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন—

''কন্যাকে অযোগ্য পাত্রে সমর্পন করা ইহা আমাদের সমাজের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। ইহা লইয়া দুশ্চিন্তা, অনুতাপ, বিরহ, অশ্রুপাত, জামাত্রিক পরিবারে বিরোধ, পিতৃকুল ও পতিকুল তার মধ্যবর্তী বালিকার নিষ্ঠুর মর্মবেদনা সদাই ঘরে ঘরে উদ্ভূত হইয়া থাকে।''

মেনকার চরিত্রের মনোবেদনার মধ্যে বাঙালি সমাজের এই স্বাভাবিক ঘটনা অত্যন্ত বাস্তবসম্মত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে।